৫১৮

(শ্রীমতী মৃণালিনী বসুকে লিখিত)

দেওঘর, বৈদ্যনাথ
বাবু প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের বাড়ি
২৩ ডিসেম্বর, ১৯০০

মা,

তোমার পত্র পাইয়া বড়ই আনন্দিত হইলাম; তুমি যা বুঝিয়াছ, তাহা ঠিক। 'স ঈশ অনির্বচনীয়ঃ প্রেমস্বরূপঃ' -- সেই ঈশ্বর অনির্বচনীয় প্রেমস্বরূপ, এই নারদোক্ত লক্ষণটি যে প্রত্যক্ষ এবং সর্ববাদিসম্মত, আমার জীবনের ইহা স্থিরসিদ্ধান্ত। অনেকগুলি ব্যক্তির একত্র নাম 'সমষ্টি', এক-একটির নাম 'ব্যষ্টি'। তুমি আমি 'ব্যষ্টি', সমাজ 'সমষ্টি'। তুমি আমি পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ বৃক্ষ লতা পৃথিবী গ্রহ নক্ষত্রাদি এক একটি 'ব্যষ্টি', আর এই জগৎটি 'সমষ্টি'-- বেদান্তে ইহাকেই বিরাট বা হিরণ্যগর্ভ বা ঈশ্বর বলে। পৌরাণিক ব্রহ্মা, বিষ্ণু, দেবী ইত্যাদি নাম।

ব্যষ্টীর ব্যক্তিগত স্বাধীনতা আছে কিনা এবং কত পরিমাণ হওয়া উচিত, সমষ্টীর নিকট ব্যষ্টীর একেবারে সম্পূর্ণ আত্মেচ্ছা, আত্মসুখ ত্যাগ করা উচিত কিনা -- এই প্রশ্ন সমাজের অনাদি কালের বিচার্য। এই প্রশ্নের সিদ্ধান্ত লইয়াই সকল সমাজ ব্যস্ত; আধুনিক পাশ্চাত্য সমাজে ইহাই প্রবল তরঙ্গ-রূপ ধারণ করিয়া সমুত্থিত হইয়াছে। যে মত ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে সমাজের প্রভুতার সম্মুখে বলি দিতে চায়, তাহার ইংরেজী নাম সোশ্যালিজম্, ব্যক্তিত্বসমর্থক মতের নাম ইন্ডিভিজুয়ালিজম্।

সমাজের নিকট ব্যক্তির -- নিয়ম ও শিক্ষার দ্বারা চিরদাসত্বের ও বলপূর্বক আত্মবিসর্জনের কি ফল ও পরিণাম, আমাদের মাতৃভূমিই তাহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। এদেশে লোকে শাস্ত্রোক্ত আইন অনুসারে জন্মায়; ভোজন-পানাদি আজীবন নিয়মানুসারে করে, বিবাহাদিও সেই প্রকার; এমন কি, মরিবার সময়ও সেই-সকল শাস্ত্রোক্ত আইন অনুসারে প্রাণত্যাগ করে। এই কঠোর শিক্ষার একটি মহৎ গুণ আছে, আর সকলি দোষ। গুণটি এই যে, দুটি-একটি কার্য পুরুষানুক্রমে প্রত্যহ অভ্যাস করিয়া অতি অল্পায়াসে সুন্দর রকমে লোকে করিতে পারে। তিনখানা মাটির ঢিপি ও খানকতক কাষ্ঠ লইয়া এদেশের রাঁধুনী যে সুস্বাদু অন্ন-ব্যঞ্জন প্রস্তুত করে, তাহা আর কোথাও নাই। একটা মান্ধাতা আমলের এক টাকা দামের তাঁত ও একটা গর্তের ভিতর পা, এই সরঞ্জামে ২০্ টাকা গজের কিংখাব কেবল এদেশেই সম্ভব। একখানা ছেঁড়া মাদুর, একটা মাটির প্রদীপ, তায় রেড়ির তেল, এই উপাদান-সহায়ে দিগ্গজ পন্ডিত এদেশেই হয়। খেঁদাবোঁচা স্ত্রীর উপর সর্বসহিষ্ণু মহত্ত্ব ও নির্গুণ মহাদুষ্ট পতির উপর আজন্ম ভক্তি এই দেশেই হয়! এই তো গেল গুণ।

কিন্তু এই সমস্তগুলিই মনুষ্য প্রাণহীন যন্ত্রের ন্যায় চালিত হয়ে করে; তাতে মনোবৃত্তীর স্ফূর্তি নাই, হৃদয়ের বিকাশ নাই, প্রাণের স্পন্দন নাই, ইচ্ছাশক্তির প্রবল উত্তেজনা নাই, তীব্র সুখানুভূতি নাই, বিকট দুঃখেরও স্পর্শ নাই, উদ্ভাবনী-শক্তির উদ্দীপনা একেবারেই নাই, নূতনত্বের ইচ্ছা নাই, নূতন জিনিসের আদর নাই। এ হৃদয়াকাশের মেঘ কখনও কাটে না, প্রাতঃসূর্যের উজ্জ্বল ছবি কখনও মনকে মুগ্ধ করে না। এ অবস্থার অপেক্ষা কিছু উৎকৃষ্ট আছে কিনা, মনেও আসে না, আসিলেও বিশ্বাস হয় না, বিশ্বাস হইলেও উদ্যোগ হয় না, উদ্যোগ হইলেও উৎসাহের অভাবে তাহা মনেই লীন হইয়া যায়।

নিয়মে চলিতে পারিলেই যদি ভাল হয়, পূর্বপুরুষানুক্রমে সমাগত রীতিনীতির অখন্ড অনুসরণ করাই যদি ধর্ম হয়, বল, বৃক্ষের অপেক্ষা ধার্মিক কে? রেলের গাড়ির চেয়ে ভক্ত সাধু কে? প্রস্তরখন্ডকে কে কবে প্রাকৃতিক নিয়মভঙ্গ করিতে দেখিয়াছে? গো-মহিষাদিকে কে কবে পাপ করিতে দেখিয়াছে?

অতি প্রকান্ড কলের জাহাজ, মহাবলবান রেলের গাড়ির ইঞ্জিন -- তাহারাও জড়; চলে-ফেরে, ধাবমান হয়, কিন্তু জড়। আর এই যে ক্ষুদ্র কীটাণুটি রেলের গাড়ির পথ হইতে আত্মরক্ষার জন্য সরিয়া গেল, ওটি চৈতন্যশীল কেন? যন্ত্রে ইচ্ছাশক্তির বিকাশ নাই, যন্ত্র নিয়মকে অতিক্রম করিতে চায় না; কীটটি নিয়মকে বাধা দিতে চায়, পারুক বা নাই পারুক, নিয়মের বিপক্ষে উত্থিত হয়, তাই সে চেতন। এই ইচ্ছাশক্তির যেথায় যত সফল বিকাশ, সেথায় সুখ তত অধিক, সে জীব তত বড়। ঈশ্বরের ইচ্ছাশক্তির পূর্ণ সফলতা, তাই তিনি সর্বোচ্চ।

বিদ্যাশিক্ষা কাকে বলি? বই পড়া? -- না। নানাবিধ জ্ঞানার্জন? -- তাও নয়। যে শিক্ষা দ্বারা এই ইচ্ছাশক্তির বেগ ও স্ফূর্তি নিজের আয়ত্তাধীন ও সফলকাম হয়, তাহাই শিক্ষা। এখন বোঝ, যে শিক্ষার ফলে এই ইচ্ছাশক্তি ক্রমাগত পুরুষানুক্রমে বলপূর্বক নিরুদ্ধ হইয়া এক্ষণে লুপ্তপ্রায় হইয়াছে, যাহার শাসনে নূতন ভাবের কথা দূরে থাক, পুরাতনগুলিই একে একে, অন্তর্হিত হইতেছে, যাহা মনুষ্যকে ধীরে ধীরে যন্ত্রের ন্যায় করিয়া ফেলিতেছে, সে কি শিক্ষা? চালিত যন্ত্রের ন্যায় ভাল হওয়ার চেয়ে স্বাধীন ইচ্ছা -- চৈতন্য-শক্তির প্রেরণায় মন্দ হওয়াও আমার মতে কল্যাণকর। আর এই মৃৎপিন্ডপ্রায়, প্রাণহীন যন্ত্রগুলির মতো উপলরাশির ন্যায় স্তূপীকৃত মনুষ্যসমষ্টির দ্বারা যে সমাজ গঠিত হয়, সে কি সমাজ? তাহার কল্যাণ কোথায়? কল্যাণ যদি সম্ভব হইত, তবে সহস্র বৎসরের দাস না হইয়া আমরাই পৃথিবীর সর্বোচ্চ জাতি হইতাম, মহামূর্খতার আকর না হইয়া ভারতভূমিই বিদ্যার চিরপ্রস্রবণ হইত।

তবে কি আত্মত্যাগ ধর্ম নহে? বহুর জন্য একের সুখ -- একের কল্যাণ উৎসর্গ করা কি একমাত্র পুণ্য নহে? ঠিক কথা, কিন্তু আমাদের ভাষায় বলে, 'ঘষে-মেজে রূপ কি হয়? ধরে-বেঁধে প্রীতি কি হয়?' চিরভিখরীর ত্যাগে কি মাহাত্ম্য? ইন্দ্রিয়হীনের ইন্দ্রিয়সংযমে কি পুণ্য? ভাবহীন, হৃদয়হীন, উচ্চ-আশাহীনের, সমাজের অস্তিত্ব-নাস্তিত্ব-জ্ঞানহীনের আবার আত্মোৎসর্গ কি? বলপূর্বক সতীদাহে কি সতীত্বের বিকাশ? কুসংস্কার শিখাইয়া পুণ্য করানই বা কেন? আমি বলি -- বন্ধন খোল, জীবের বন্ধন খোল, যতদূর পার বন্ধন খোল। কাদা দিয়ে কাদা ধোয়া যায়? বন্ধনের দ্বারা কি বন্ধন কাটে? কার কেটেছে? সমাজের জন্য যখন সমস্ত নিজের সুখেচ্ছা বলি দিতে পারবে, তখন তো তুমিই বুদ্ধ হবে, তুমিই মুক্ত হবে, সে ঢের দূর! আবার তার রাস্তা কি জুলুমের উপর দিয়ে? আহা!! আমাদের বিধবাগুলি কি নিঃস্বার্থ ত্যাগের দৃষ্টান্ত, এমন দৃষ্টান্ত কি আর হয়!!! আহা বাল্য বিবাহ কি মধুর!! সে স্ত্রী-পুরুষের ভালবাসা না হয়ে কি যায়!!! এই বলে নাকেকান্নার এক ধূয়ো উঠেছে। আর পুরুষের বেলা অর্থাৎ যাঁদের হাতে চাবুক, তাঁদের বেলা ত্যাগের কিছুই দরকার নেই। সেবাধর্মের চেয়ে কি আর ধর্ম আছে? কিন্তু সেটা বামুন-ঠাকুরের বেলায় নহে, তোমরাই কর। আসল কথা, মা-বাপ আত্মীয়-স্বজন প্রভৃতি এদেশের -- নিজের স্বার্থের জন্য, নিজে সামাজিক অবমাননা হইতে বাঁচিবার জন্য পুত্র-কন্যাদি সব নির্মম হইয়া বলিদান করিতে পারেন, এবং পুরুষানুক্রমে শিক্ষা মানসিক জড়ত্ব বিধান করিয়া উহার দ্বার উন্মুক্ত করিয়াছে। যে বীর, সে-ই ত্যাগ করতে পারে; যে কাপুরুষ, সে চাবুকের ভয়ে এক হাতে চোখ মুচছে আর আর এক হাতে দান করছে, তার দানের কি ফল? জগৎপ্রেম অনেক দূর। চারাগাছটিকে ঘিরে রাখতে হয়, যত্ন করতে হয়। একটিকে নিঃস্বার্থভাবে ভালবাসতে শিখতে পারলে ক্রমে বিশ্ব-ব্যাপী প্রেমের আশা করা যায়। ইষ্ট-দেবতাবিশেষে ভক্তি হলে ক্রমে বিরাট ব্রহ্মে প্রীতি হতে পারে।

অতএব একজনের জন্য আত্মত্যাগ করতে পারলে তবে সমাজের জন্য ত্যাগের কথা কহা উচিত, তার আগে নয়। সকাম থেকেই নিষ্কাম হয়। কামনা না আগে থাকলে কি কখনও তাহার ত্যাগ হয়? আর তার মানেই বা কি? অন্ধকার না থাকলে কি কখনও আলোকের মানে হয়?

সকাম সপ্রেম পূজাই প্রথম। ছোটর পূজাই প্রথম, তারপর আপনা-আপনি বড় আসবে।

মা, তুমি চিন্তিত হয়ো না। বড় গাছেই বড় ঝড় লাগে। কাঠ নেড়ে দিলে বেশি জ্বলে, সাপের মাথায় আঘাত লাগলে তবে সে ফণা ধরে ইত্যাদি।[১] যখন হৃদয়ের মধ্যে মহা যাতনা উপস্থিত হয়, চারিদিকে দুঃখের ঝড় উঠে, বোধ হয় যেন এ-যাত্রা আলো আর দেখতে পাবো না, যখন আশা-ভরসা প্রায় ছাড়ে ছাড়ে। তখনই এই মহা আধ্যাত্মিক দুর্যোগের মধ্য হইতে অন্তর্নিহিত ব্রহ্মজ্যোতি স্ফূর্তি পায়। ক্ষীর-ননী খেয়ে, তুলোর উপর শুয়ে, একফোঁটা চোখের জল কখনও না ফেলে কে কবে বড় হয়েছে, কার ব্রহ্ম কবে বিকশিত হয়েছেন? কাঁদতে ভয় পাও কেন? কাঁদো। কেঁদে কেঁদে তবে চোখ সাফ হয়, অন্তর্দৃষ্টি হয়, তবে আস্তে আস্তে মানুষ জন্তু গাছপালা দূর হয়ে তার জায়গায় সর্বত্র ব্রহ্মদর্শন হয়। তখন --

> ‘সমং পশ্যন্ হি সর্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরম্।
> ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং ততো যাতি পরাং গতিম্।।’

-- সর্বত্র সমানভাবে বিদ্যমান ঈশ্বরকে জানিয়া নিজে আর নিজেকে হিংসা করেন না (অর্থাৎ সবই তিনি), তখনই পরমা গতি প্রাপ্ত হন।

সদা শুভাকাঙ্ক্ষী

বিবেকানন্দ

---

[১] তুলনীয়: The wounded Snake its hood unfurls
The flame stirred up doth blaze etc.
The Song of the Free: Swami Vivekananda